

চরিত্র চিত্রণের আলেখ্যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সওদাগরের নৌকা’

ছন্দা ঘোষ

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/12_Chhanda-Ghosh.pdf

সারসংক্ষেপ: স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্যসাহিত্যে জীবনের আত্মিক সংকট দেখা যায়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতিতেই তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য করেছেন। এই প্রবন্ধে সেই সংকটের চিত্রকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সূচক শব্দ: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সওদাগরের নৌকা, সতী চরিত্র, কালো চরিত্র।

স্বাধীনোত্তর বাংলা সাহিত্যে সময়ের চাহিদা অনুসারে যখন নাটকের বিষয়বস্তু ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে, শুধু গ্রাম্য জীবনের দুর্গতি ও প্রতিরোধ নয়, শহর জীবনের আত্মিক সংকটও নাটকের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠল, গ্রুপ থিয়েটারগুলো যখন এই বিষয়টি তুলে ধরতে চাইলেন ঠিক তখনি বাংলা থিয়েটারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাট্যকার, নট ও নাট্যপরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরচনা মূলত অভিনয়ের প্রয়োজনে, কিন্তু একই সঙ্গে সেসব নাটক শিল্পসার্থকও। তাঁর সমগ্র নাট্যসৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় — মৌলিক নাটক এবং রূপান্তরিত নাটক। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে তাঁর রূপান্তরিত নাটক। তবে তাঁর মৌলিক সৃষ্টিও কোনো অংশে কম নয়। ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকটি তাঁরই শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত।

‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকটির ‘নক্ষত্র’ সংস্করণের ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই লিখেছিলেন, ‘... এটি কোথাও যে ছাপা হবে, বই হবে এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ছাড়া আর কারো ভালো লাগবে সে কথা ভাবিনি’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দ। নাটকটি রচিত হয় বাগবাজার রামকান্ত বসু স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে। প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ‘বহুব্রূপী’ পত্রিকায়, সম্ভবত শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদবণিকের পালা’ নাটকটির আত্মপ্রকাশের পরেই। ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর জন্মস্মরণী দিন এবং নাটকটির গ্রন্থরূপ দেন শ্রী শ্যামল ঘোষ। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ‘নান্দীকার’ গোষ্ঠী নাটকটি প্রয়োজনা করে। আর নান্দীমুখের প্রয়োজনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। রাধারমণ তপাদার ছিলেন অভিনয় পরিচালক এবং ‘প্রসন্ন’ চরিত্রে অভিনয় করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। নাট্য অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হয় ‘দেশ’, ‘অমৃত’, ‘ফ্রন্টিয়ার’ ইত্যাদি পত্রিকায়।

নাটকের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে (ভাষা, কাহিনি, রচনশৈলী ইত্যাদি) চরিত্র একটি প্রধান উপাদান। এই নাটকের মোট চরিত্র সংখ্যা সাতটি: প্রসন্ন, সতী, কালো, আশা, হরিসাধন, মাধব গড়াই, কালীকৃষ্ণ। নাটকের মূল চরিত্র প্রসন্ন। তাঁকে ঘিরেই বাকি সব চরিত্রের উপস্থিতি এবং নাট্যকাহিনির, এমনকি প্রসন্ন চরিত্রকে কেন্দ্র করে বাকি সব চরিত্র নাট্য কাহিনিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। নাটকের প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব ভূমিকায় নাটকের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করেছে এবং রস পরিণতিতে অনন্য ভূমিকা রেখেছে।

‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকটিতে যে সব শিল্পীরা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তারা —
সতী চরিত্র: প্রথমে লতিকা বসু, পরে বীণা দে,

কালো চরিত্র: রাধারমণ তপাদার, অসিত কুণ্ডু, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

আশা চরিত্র: ছায়া ঘোষ

হরিসাধন চরিত্র: অরুণ চট্টোপাধ্যায়

মাধব গড়াই : অসিত কুণ্ডু

কালীকৃষ্ণ চরিত্র: রণজিৎ চক্রবর্তী

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং প্রসন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন ও নাটকটির মঞ্চরূপ দেন, ফলে নাটকটি মঞ্চ সফল হয়ে উঠেছিল।

এই নাটকটি যাত্রা দলের প্রবীণ নেতা বাতিল নটের জীবনের, সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার স্বপ্ন নিয়ে রচিত। প্রসন্ন হলো বাতিল নট যার জীবনে স্বপ্ন ফুটে উঠেছে এই নাটকের মধ্যে। এক দিকে সে ছিল পরিবারের কর্তা স্বামী পিতা এবং সাধারণ মানুষ। আর অপরদিকে ব্যর্থ শিল্পীর হাহাকার দারিদ্র, শিল্প সংসারে। পাঁচটি পর্বের বিভক্ত ছিল এই নাটকটি। নবনাট্যের সময় থেকে বাংলা নাটকের এই পর্ব বিভাজন দুটি অর্ধে ভাগ হয়ে যায়। এই দুই অর্ধের মাঝখানে ঘোষিত হয় ১০-১৫ মিনিটের বিরতি। যা সওদাগরের নৌকা নাটকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি পর্বের কাহিনিতে রয়েছে বাতিল নট প্রসন্ন-এর জীবনের বাস্তব রূপ। প্রথমেই কাহিনি শুরু হয় প্রসন্ন ও সতীর দাম্পত্য কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, হঠাৎ করেই যেন তাদের কথোপকথন অতীতের পক্ষে মোড় নেয়। তখন জানা যায় প্রসন্ন একজন প্রাক্তন নট সে জীবন ও নাট্যের সংমিশ্রণে হারিয়ে ফেলে সঞ্চিত। তাই তাকে পাগলা গারদে থাকতে হয়, সে এখন সুস্থ, প্রসন্ন ও সতীর দাম্পত্য জীবনের আরেক অঙ্গ ছিল কালো। প্রসন্ন কালোকে ভালোবাসত ঠিকই কিন্তু কালোর রাগের জন্য সে তাকে ভয় পেত। প্রসন্নের স্ত্রী সতী, পুত্র কালোকে নিয়েই প্রসন্নের সংসার। প্রসন্নের এক সময় প্রবল প্রতিপত্তি অর্থ সবই ছিল কিন্তু আজ সে বৃন্দ পাগল জরাজীর্ণ বিপর্যস্ত অভাবগ্রস্ত মানুষ। একমাত্র সন্তান কালোর কাছে সে যেন অপ্রয়োজনীয় অসহ্যকর মানুষ। একমাত্র তার সাময়িক সুস্থতার আশ্রয়স্থল স্ত্রী। প্রসন্ন তাই সতী সম্পর্কে বলেছে — “বড় বউ তুমি লক্ষী। তুমি আমার বুক জুড়ানো মানিক, মাঝে মাঝে এমন হয় না, একটা মেয়েই সংসারের সব হয়-মা বউ মেয়ে? তুমি আমার তাই।” প্রসন্ন তার ছেলে কালোকে ভয় পায় বলেই তার মনে সর্বদা জেগে ওঠে, কালো বিয়ে করে হয়তো তার বাবা-মাকে তাড়িয়েদেবে। তাই প্রসন্ন আশাকে জিজ্ঞাসা করেছে —

“প্রসন্ন।। আমার সঙ্গে পৃথক হয়ে যাবে নাকি বিয়ের পরে?”

আশা।। না।

প্রসন্ন।। তুমি বড় মেয়ে মা তুমি তো ওর ইচ্ছাটা বোঝা?

আশা।। হ্যাঁ ওর ইচ্ছে। কিন্তু আমি মানা করি।

প্রসন্ন।। ও কি বলে?

আশা।। ও তো আমার কথা শুনতেই চায় না।

প্রসন্ন।। তুমি ভালো করে বলো ও শুনবে। জোয়ান ছেলেরা জোয়ান মেয়েদের কথা ফেলতে পারে না। তুমি বুঝিয়ে বলো, আমি ওর বাবা বুড়ো মানুষ ওর মায়ের কত বয়স হয়েছে! ওই এক বস্ত্রে সংসারটার জন্য দিন রাত খাটছে। সে তো ওই কালোর সুখের জন্যে, তাই না?” আবার নাটকের প্রথম দিকে সতীর কাছে প্রসন্নের আবদারের ছবি ফুটে উঠে লুচি খাবার প্রসঙ্গে। প্রসন্ন সতীকে দুটো লুচি ভেজে দেবার কথা বললে, উত্তরে সতী সকালের বদলে সন্ধ্যায় লুচি ভেজে দেবে বলে। তখন প্রসন্ন আবদার করে বলে উঠে — “ও বেলা কিন্তু তাহলে চারটে দিতে হবে।” স্ত্রী সতীর কাছে প্রসন্ন চেয়ে বড়ো এই মহাজগতে আর কেউ নেই। সতী প্রসন্ন সম্পর্কে বলেছে —

“তোমার চেয়ে বড় সংসারে আমার কেউ নেই, কেউ কোনদিন ছিল না। সূর্য সাক্ষী ভগবান সাক্ষী কেউ কোনদিন না।” কর্মে ও কথায় সতী ছিল প্রসন্নের যথার্থ সহধর্মিণী। প্রসন্নের চলমানতায় সতীই তাকে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। তারা দুজনেই ছিল একে অপরের পরিপূরক।

কালো চরিত্রটি ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয় ক্ষুধা ও দরিদ্র ছিল কালোর নিত্যদিনের জীবনসঙ্গী। দিনরাত পরিশ্রম করে পাগলামি তার জীবনকে তছনছ করে দেয়। ‘পাগল’ শব্দটি তার কাছে ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কালো বাবা মা, আশা, সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চাই। অন্যদিকে প্রসন্ন ও আঁকড়ে ধরতে চায় কালোকে সেই জন্যই প্রসন্ন আশার বাবাকে নিজের পরিবার সম্পর্কে নানা কথা বলে। ক্ষুধার তাড়না কালোকে দিন দিন ক্রুদ্ধ করে তোলে ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার বাবার কাছে ক্ষমা চায়, প্রসন্নকে পুনরায় শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কালোরও পছন্দ এই নাটকের মধ্যে দুই বিপরীত প্রান্তের যাত্রী, একদিকে কালো সদায় মৃত্যু কিন্তু অন্যদিকে নতুন করে বাঁচবার স্বপ্ন দেখে। এই দুই চরিত্রই যেন নাটকের মধ্যে কার দ্বন্দ্বকে টানটান করে রেখেছে। আশা কালোর হবু বউ। কালোর আচরণে আশাবতী ব্যথিত। আশাকে কেন্দ্র করে প্রসন্ন ও কালোর সংঘাত জটিল আকার ধারণ করে। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্র যেন আশার স্বপ্নে বিভোর। সেই আশা জাগাচ্ছে আশাবতী। তার সুখের সংসার গড়ার এক অপূর্ণ স্বপ্ন রয়েছে চোখের মধ্যে।

অন্যদিকে প্রসন্ন হরিসাধনের অনুরোধে নতুন দল খোলার স্বপ্ন দেখে। হরিসাধনের সান্নিধ্যে এসে প্রসন্ন শিল্পী চেতনা ফিরে পায়। কারণ হরিসাধন প্রসন্নকে তাদের দুজনে মিলে একটা দল তৈরি করার কথা বলে — “চলো না দাদা, দুজনে আবার একটা দল করি? আমরা গান গাইবো দুজনে?” দুজনের কথোপকথনের সময় প্রসন্নের বাড়িতেই মাধব গড়াইয়ের প্রবেশ — “নমস্কার বড়োকর্তা, ভালো আছেন?” যাত্রা দলের নতুন অধিকারী মাধব গড়াইয়ের সঙ্গে প্রসন্ন বেড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পরম মুহূর্তে গর্তের মধ্যে থেকেই ‘সাপুড়ের বাঁশি’ শুনে জেগে ওঠে প্রসন্ন আবার বাঁচার তাগিদ। কিছুদিন পরেই ফিরে এসে দেখে হরিসাধনের অকস্মাৎ মৃত্যু। প্রসন্ন যন্ত্রণায় চিৎকার করে ছটফটিয়ে বলে ওঠে — “সাধন, দল গড়বে বলেছিল যে।” হরিসাধনের মৃত্যু প্রসন্নের কাছে নিজের মৃত্যুকেই উপলব্ধি করায়। আবার দেখি প্রসন্ন অন্য দলের অধিকারী ব্যবসায়ী কালীকৃষ্ণের ডাকে কম অর্থের চুক্তিতেই অভিনয় করতে রাজি হয়। সেখানে রক্তের প্রতিদান, হাসুহানা, চাঁদ সদাগর পালা অভিনয় করার কথা আছে।

‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকের প্রসন্ন চরিত্রটি একদিকে সমাজের বাস্তব চিত্র বহন করে, অপরদিকে একটি ব্যর্থ শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, আশা, স্বপ্ন ও অস্তিত্বের যন্ত্রণাকে গভীরভাবে তুলে ধরে। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রই আশার প্রতীক। নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যে আত্মপ্রকাশ, তা নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন — “অজিতের সেই জাতের মহানায়ক — যে ইতিহাসের নায়ক হওয়ার জন্য জন্মেছে এবং সেই ইতিহাস ক্ষেত্র কর্ষণ করে সোনার ফসল ফলিয়ে তা আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন, দর্শক সাধারণ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবে।”

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতেশ, ‘নাটক সংগ্রহ ১’, গান্ধর্ব, ১৮এ, মজেন্দ্র দে লেন, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১১
২. বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতেশ, ‘নাটক সংগ্রহ ২’, গান্ধর্ব, ১৮এ, মজেন্দ্র দে লেন, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১১
৩. মুখার্জি অজিতকুমার, ‘বাংলা নাট্যকার ইতিহাস’, মডার্ন পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৮
৪. ভট্টাচার্য আশুতোষ, ‘বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)’, খাজা এন্ড সন্স, কলকাতা, ২০০৩
৫. মজুমদার দেবশঙ্কর, ‘বাংলা যুক্তিবাদের ইতিহাস’, পুস্তক বিপণী, নভেম্বর ২০১৬
৬. মজুমদার দেবশঙ্কর, ‘গণনাট্য আন্দোলন’, অনুষ্টুপ, ২২ নীচু কুন্দু লেন, ডিসেম্বর ২০০৯
৭. মুখার্জি দিগন্ত, ‘বঙ্গরঞ্জা বিচিত্রা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব’, বাংলা পুস্তক ভবন, জানুয়ারি ২০১০
৮. Gangopadhyay Abhijit, “Globalization in Bengali Drama and Ajitesh Bandopadhyay”, International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), Vol. 2, No. 4, 2015, pp. 50–65

৯. Konar Rajdeep, “Ajitesh Bandopadhyay: In the Neighbourhood of Liminality”, Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Volume V, Number 2, 2013.

লেখক পরিচিতি: ছন্দা ঘোষ, গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ।